আবদুল মান্নান সৈয়দ : সমালোচনা চিন্তার প্রাতিস্বিকতায়

মুনিরা সুলতানা*

সারসংক্ষেপ : কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-সমালোচনা-উপন্যাস-নাটক-চিত্রকলাসহ আধুনিক প্রায় সকল সাহিত্য-উদ্ভাবনায় সৃষ্টির নিদর্শন রেখেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)। তাঁর সাহিত্যজীবন পঞ্চাশ বছরের। ছন্দ, সাহিত্যকাঠামো, রূপতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব ও প্রাচ্য-প্রতীচ্য সাহিত্যতত্ত্ব সবই ছিল তাঁর অধিগত। বিশেষত সাহিত্যের শৈলী-শনাক্তকরণ ও বিচার-ব্যাখ্যায় তাঁর প্রকাশভঙ্গি অনন্য। ক্ল্যাসিক, আধুনিক ও সমকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যরচনায় তিনি নিরলস কাজ করেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে কিংবা সাহিত্য-সমালোচনায় তাঁর বহুচারী স্বভাব ও একাগ্র মানস নতুন সৃষ্টির পথে সবসময় ধাবিত হয়েছে। সমালোচনা তাঁর কাছে সৃষ্টির পরিপূরক নবনির্মাণ। সমালোচকের প্রমিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি একাধারে সমালোচনার পরিধি, পদ্ধতি ও রূপকল্পের নানা দিকের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। সেইসাথে সমালোচনাকর্মের মাধ্যমে গদ্য ও গদ্যসাহিত্যের মান নির্ণয়েরও এক অসামান্য প্রচেষ্টা ছিল মান্নান সৈয়দের। বর্তমান প্রবন্ধে আবদুল মান্নান সৈয়দের সমালোচনা-চিন্তা, মতাদর্শ ও তাঁর সাহিত্য-মূল্যায়ন ভঙ্গিমা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে সমালোচনা হলো সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে বুদ্ধির প্রক্রিয়ার সম্মিলন। সাহিত্যসৃষ্টির মানস-প্রক্রিয়াকে যারা বিচার করেন, তাদের সম্পর্কে সাহিত্যস্রষ্টার রয়েছে বিচিত্র ভাবনা। লেভ তলস্তয়ের বিশ্বাস, "Crtics are the stupid who discuss the wise." (বিমলকুমার, ২০০৬ : ৯)। প্রচলিত আছে যে গ্যায়টে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে "kill the dog he is a reviewer." (বিমলকুমার, ২০০৬ : ৯)। টি. এস. এলিয়ট সমালোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর *Function of Criticism* (1923)-এ লেখেন যে সমালোচনা হলো "elucidation of taste"। আবার 'The Frontiers of Criticism' (1956) নামক লেখায় তিনি তাঁর পূর্বোক্ত বক্তব্যকে কিছুটা সংস্কার করে বলেছেন সমালোচনা হল "to promote the understanding and

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i1.6

enjoyment of literature." (Raghukul 1986 : 2)। কালে কালে সমালোচনা সম্পর্কিত ভাবনা বদলেছে; দ্বান্দ্বিকতা বা বিভিন্নতা নিয়ে সমালোচনা তত্ত্বও নানা আকার পেয়েছে। তবে সমালোচকের সংবেদনশীল মন উৎকৃষ্ট শিল্পের উপভোগ-অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চকে বর্ণনা দিয়ে যাবেন, সেটা যে পদ্ধতিতে বা যে ভঙ্গিমাতেই হোক – এটি এক প্রকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সাহিত্য-বিচার বা মূল্যায়ন প্রচেষ্টার ও সেইসাথে সাহিত্যবিচারকের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত – এ বিষয়ক জিজ্ঞাসা অনেক। সাহিত্য সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলের সাথেই মূলত সমালোচনা-চিন্তার পরিবর্তন সম্পৃক্ত। এর পেছনে সমাজ-সংস্কৃতি-কাঠামোর বিবর্তনও দায়ী। এ সূত্রেই সমালোচনাতত্ত্ব কখনও সৌন্দর্যবাদী, বিষয়-রস-আনন্দবাদী, কখনও রূপবাদী, কখনও ব্যবহারবাদী, বস্তুবাদী বা সৃজনশীল হয়েছে।

দুই

বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার সূত্রপাত ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি। সে-সময় বাংলা সাময়িকপত্রে সাহিত্যবিচার বা মূলত সাহিত্যতত্ত্ব প্রসঙ্গে প্রকাশিত রচনাগুলো বাংলা সমালোচনার সমৃদ্ধিতে গভীর অবদান রেখেছিল। এ পর্যায়ে সমালোচনা ছিল মূলত ইতিহাস-জিজ্ঞাসু এবং কিছুটা পাশ্চাত্যরীতি অনুসারী। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে সার্থক করে তোলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের প্রত্যয়ে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা সার্থক হয়েছিল বহু সংখ্যক লেখকের জন্ম দিয়ে। এই সময় বাঙালি জাতির স্বাদেশিকতার বোধও ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়েছে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বিবাচনিকতায় আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনার গোড়াপত্তন হয়েছে। বঙ্কিমী-সমালোচনা বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিনিষ্ঠ, সমাজ-ইতিহাস বীক্ষণসমৃদ্ধ এবং রসবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। আর্দশ সমালোচকের দায়িত্ব নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তীকালে আরও অনেকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজ নিজ মত প্রকাশ করেছেন। বাংলা ব্যবহারিক সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রধান পথ প্রর্দশক এবং একজন সফল সমালোচক। ঊনিশ শতকী সাহিত্য সমালোচনায় কখনও কখনও নান্দনিক প্রতীতির তুলনায় নৈতিক দৃষ্টিকোণ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এ পর্যায়ে সাহিত্য সমালোচনায় নবজাগ্রত চেতনার উদ্‌ভাসন ও উপলব্ধির নতুন মাত্রা অনুভব করালেন রবীন্দ্রনাথ। সমালোচনাকে প্রায় পুরোপুরি শিল্পে পরিণত করে একই সাথে সাহিত্যের স্বরূপ, তত্ত্ব, উদ্দেশ্য, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি জিজ্ঞাসাকে সমালোচনায় একীভূত করেছেন তিনি। *সমালোচনা* (১৮৮৮), *প্রাচীন সাহিত্য* (১৯০৭), *সাহিত্য* (১৯০৭) *সাহিত্যের পথে* (১৯০৬), *সাহিত্যের স্বরূপ* (১৯৪৩) প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেছেন, সমালোচনাও সৃজনাত্মক মননের শক্তিতে সার্থক শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পারে। *সাহিত্যের পথের* 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> যাকে আমরা সাহিত্য-সমালোচনা বলি সাহিত্য বিচার শব্দটাকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি। আলোচনা অর্থে বুঝি পরিক্রমা, বিষয়টির উপর পায়চারি করে

> বেড়ানো আর বিচার হল পরিচয় – তাকে যাচাই করা। বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিচারের লক্ষ্য। সাহিত্যবিচারের পরিচয়টি সাহিত্যিক পরিচয় হওয়া চাই একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভাগ্যদোষে আমাদের দেশে বাহুল্য নয়। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৪ : ৪৪২)

সাহিত্যবিষয়ক রচনাসমূহে বিশেষত 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমালোচকের যুক্তিনিষ্ঠা ও মননশীলতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব বা সমালোচনা ভঙ্গি থেকে ধরে নেয়া যায় যে এর কেন্দ্রে রয়েছে আস্বাদান তথা আনন্দবাদিতা। তাঁর সমালোচনা-সাহিত্য কার্যত এই কথাই বলে যে, ব্যাখ্যা-পরিচয়-বিচার সাহিত্যের সাহিত্যগুণের সঙ্গে যুক্ত হলে সবই সমালোচনা।

বিশ শতকী সমালোচনার চিন্তাবিশ্ব ঊনিশ শতক থেকে ক্রমেই স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিল। নতুন সমালোচনাতত্ত্ব তথা ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতি-পুরাণ সর্বোপরি সাহিত্য সম্পর্কিত নব বীক্ষণ এ যুগের সাহিত্য সমালোচনার দিক পরিবর্তনের সূচক। প্রয়োগের দিক থেকে বাংলা আধুনিক সমালোচনা অনেকটা পাশ্চাত্য স্বভাবজাত। পাশ্চাত্য রোমান্টিক সমালোচনা অনুযায়ী "সমালোচকের প্রথম গুণ হল তিনি যেকোনো সাহিত্যকর্মের ভাবটি (impression) আপন হৃদয়ে গ্রহণ করতে সক্ষম; দ্বিতীয় গুণ – সেই ভাবকে আপন করে পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে সক্ষম।" (অরুণকুমার ২০০২ : ১৬)। বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বাংলা সমালোচনায় নতুনত্ব দেখা দিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি, ম্যাথু আর্নল্ড, ওয়াল্টার পেটার-এর সমালোচনা-আদর্শের পরিবর্তে আধুনিক ইংরেজি সমালোচক, যথা – টি. এস. এলিয়ট, এজ্‌রা পাউন্ড, আই. এ. রিচার্ডস্, রেনে ওয়েলেক প্রমুখের কাব্য-প্রত্যয়, সমালোচনা-ভাবনার চর্চা ব্যাপকতর হলো। প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখের সমালোচনায় সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক মৌলিক জিজ্ঞাসাসহ সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাসের পটে সাহিত্যবিচারের নব নব অনুধ্যান প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশভঙ্গিতে বিশেষত কথ্যচ্ছন্দের প্রতি মনোযোগ, গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ সাধন, আবেগের পরিবর্তে বুদ্ধিকে প্রাধান্য দান – প্রভৃতি গুণ সমকালীন সাহিত্য-সমালোচনায় লক্ষ করা যায়। বস্তুত অনেকান্তিকতাই ক্রমশ নতুন পথসন্ধানী বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের গোত্রলক্ষণ হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, শঙ্খ ঘোষ, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রিয়নাথ সেনসহ বাংলা আধুনিক সমালোচকেরা তা প্রমাণ করেন। সাহিত্য সমালোচনা সৃষ্টিশীল শিল্পকর্ম হিসেবে গ্রহীতা পাঠকের সংবেদনশীলতাকে উত্তরোত্তর উৎকর্ষের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে – বিশ শতকী বাংলা সমালোচনায় সেই সম্ভাবনাই ক্রমান্বয়ে পরিণতি পেয়েছে।

তিন

দেশ-বিভাগোত্তর বাংলাদেশকেন্দ্রিক সমালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো ষাটের দশক। রাষ্ট্রিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভাগোত্তর কালে পূর্ব বাংলায় সাহিত্য গবেষণা বিভিন্ন টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে উপান্তে মূল্যায়নধর্মী গবেষণাতেই স্থিত হয়েছিল। "এই পর্বের গবেষকদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট মতাদর্শের প্রতি ছিলেন প্রতিশ্রুতিশীল, 'আইয়ুবি দশকে' তাদের কেউ শাসকগোষ্ঠীর নীতির পরিচর্যা করেছেন, কারও সাহিত্য গবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে স্বজাত্যানুরাগ, অন্ধ ঐতিহ্যপ্রীতি এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি।" (ভীষ্মদেব; ২০০৩ : ১০১)

তবে ষাটের দশক থেকেই পূর্ব বাংলায় প্রতিকূল প্রতিবেশ উপেক্ষা করে সাহসী সাহিত্য-সমালোচক, গবেষকগণ আন্তর্জাতিক মানের সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন; নিজস্ব সাহিত্যচিন্তা ও সমালোচনা-ভাবনা প্রকাশ করেছেন। এ দশকে পরিব্যাপ্ত জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রমুখী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় আধুনিক বিষয় ও গবেষণা পদ্ধতির অবলম্বন ও প্রয়োগসাফল্যও ছিল। এ পর্যায়ে সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা বা মূল্যায়নের সমান্তরালে সাহিত্য সমালোচনায় আধুনিক সাহিত্য প্রাধান্য পেয়েছে। "এ কালের সাহিত্য গবেষণায় ইতিহাসের ধারা বর্ণনার ক্ষেত্র অধিকার করেছে সমাজতাত্ত্বিক ও নন্দনতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি। রবীন্দ্রসাহিত্য এবং তুলনামূলক সাহিত্য এ পর্যায়ের সাহিত্য গবেষণার হয়েছে বিষয়ীভূত।" (ভীষ্মদেব, ২০০৩ : ১০২-১০৩)। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল সমৃদ্ধ শাখা তথা উপন্যাস, কবিতা ও ছোটগল্প বিষয়ে মূল্যায়নধর্মী সমালোচনা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী চিন্তায় ইতিহাস-ঐতিহ্য-মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির পটে সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন, শিল্পের স্বরূপে শিল্পকৃতির বিশ্লেষণ সর্বোপরি আধুনিক সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব সম্পর্কিত নবায়মান জিজ্ঞাসার আলোকে সমকালীন সমালোচনা ক্রমশ পূর্ব বাংলার সাহিত্য সমালোচনায় পরিণত হয়েছে। বিভাগোত্তর বাংলায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সমালোচক হলেন: মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৬৬৭), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৯-২০০৮), আবদুল হাফিজ প্রমুখ। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিষয়- বৈচিত্র্যের অনুষঙ্গে রূপ ও রীতির মূল্যায়ন, তুলনামূলক বিবেচনা এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বসহ অতি সাম্প্রতিক সাহিত্যতত্ত্বের অনুসরণ ও অনুশীলনে বাংলাদেশকেন্দ্রিক সাহিত্য সমালোচনাও সমৃদ্ধ হয়েছে, যার মাঝে প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য গবেষণাকর্মও রয়েছে।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০) ষাটের দশক এবং পরবর্তীকালেরও একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক যিনি কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-গবেষণা, জীবনী, নাটক/কাব্যনাটক, স্মৃতিকথা, অনুবাদ-কবিতা, সম্পাদনা – সব ধরনের গ্রন্থ

রচনাতেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন প্রবন্ধ বা সমালোচনা-প্রবন্ধ। এর মাঝে স্বাধীনভাবে রচিত গবেষণাপত্রও রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অনেক লেখকের সমালোচনা করেছেন তিনি। তার আলোচনা থেকে কম গুরুত্বপুর্ণ লেখকও বাদ পড়েননি। বিশেষত কবি ও কবিতা বিষয়ে তাঁর রচনাপ্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য তুলনাহীন।

আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রবন্ধ গ্রন্থগুলো হচ্ছে : *নির্বাচিত প্রবন্ধ* প্রথম খণ্ড (১৯৭৬) ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৮৭), *নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা* (১৯৭৭), *করতলে মহাদেশ* (১৯৮৯), *দশ দিগন্তের দ্রষ্টা* (১৯৮০), *বেগম রোকেয়া* (১৯৮৩), *আমার বিশ্বাস* (১৯৮৪), *ছন্দ* (১৯৮৫), *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্* (১৯৮৬), *নজরুল ইসলাম : কালজ ও কালোত্তর* (১৯৮৭), *চেতনায় জল পড়ে শিল্পের পাতা নড়ে* (১৯৮৯), পুনর্বিবেচনা (১৯৯০), *দরোজার পর দরোজা* (১৯৯১), *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য* (১৯৯৮), *বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা* (১৯৯৪), *বাংলা সাহিত্যে মুসলমান* (১৯৯৪), *রবীন্দ্রনাথ* (২০০১), *আধুনিক সাম্প্রতিক* (২০০১)।

মান্নান সৈয়দের সমালোচনা-চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেক প্রবন্ধেই; এছাড়া তাঁর সমালোচনা-ভঙ্গি থেকেও তা কিছুটা অনুমান করা যায়। তবে *বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা* গ্রন্থে স্থান পাওয়া কয়েকটি প্রবন্ধে তাঁর এ বিষয়ক ভাবনা যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধগুলো হলো : 'সমালোচনা' (১৯৮৭), 'সমালোচনার সামাজিক দায়' (১৯৮৮), 'সমালোচনার সমালোচনা' (১৯৮৯)। এই প্রবন্ধগুলোতে তিনি সমালোচনার একটা সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করতে চেয়েছেন এবং সমালোচনার উদ্দেশ্য, সাধারণ পাঠক ও সমালোচকের পার্থক্য, আদর্শ সমালোচকের লক্ষণ, সমালোচনার তাত্ত্বিক রূপ-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এছাড়া বাংলা সমালোচনা-ধারার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও রয়েছে উল্লিখিত প্রবন্ধের একটিতে। সাহিত্য-সমালোচনা বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে নন্দনতাত্ত্বিকেরা নানা মত পোষণ করেছেন। সাধারণত সমালোচনার প্রকৃতি বা গোত্র চিহ্নিত হয়ে থাকে একজন সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে। সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন বিষয়ক মতাদর্শ প্রকাশ করতে গিয়ে সমালোচনার স্বরূপ বিষয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন :

> সমালোচনা সাহিত্যের একটি পরিমাপক।... বিশুদ্ধ সমালোচনা ব'লে কিছু নেই, নির্বস্তুক সমালোচনা ব'লে কিছু নেই।... সমালোচনা অবিশুদ্ধ, ধারাবাহিক, পারম্পর্যময়। (মান্নান, ১৯৯৪ : ১)

> সমালোচনা সৃজনকাজকে অন্তঃশীল গতি দ্যায়, রূপরেখা দ্যায়, অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে বর্তমানের শিল্পকলাকে মেলায়। (মান্নান, ১৯৯৪ : ১)

কী সমালোচনা আর কী নয় সে প্রসঙ্গে তিনি একে 'বহুবিধ ভিন্ন ধরনের ক্রিয়ার মিশ্রণ' হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। সমালোচনাকে বিচার-বিশ্লেষণমূলক,

সৃষ্টিশীল, মূল্যবিচারমূলক সব অভিধাই দিতে চেয়েছেন তিনি। ব্যাখ্যা, বিচার, রস-পরিচয় সাধারণভাবে এই তিনকে নিয়ে সমালোচনার সমগ্রতা বলে ধরে নেয়া যায়। তবে সমালোচনায় এই তিনেরই স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে। সমালোচনা কি বিশ্লেষণ না অন্যকিছু সে প্রসঙ্গে মান্নান সৈয়দ বলেন :

> মন্তব্য সমালোচনা নয়, সমালোচনা মানে বিশ্লেষণ। সে বিশ্লেষণে রচয়িতার অন্তঃপ্রকৃতি বিশ্লেষিত হয় না, হয় তার সমকালীন দেশ-কালও, তার ধারাবাহিকতাও। (মান্নান, ১৯৯৪ : ৭)

আবার সমালোচনা রচনাবিশেষের মূল্যায়ন হলে তা বিচারপন্থী কিনা সে ব্যাপারে মত প্রকাশ করে মান্নান সৈয়দ লিখেছেন :

> ...সমালোচনার ক্ষেত্রে বিচারের একটি বিষয় এসেই যায়। মান নির্ধারণও সমালোচককে করতে হয় – কখনো প্রত্যক্ষত, পরোক্ষে কখনো। ...সমালোচককে হতে হয় দিবালোকের মতো স্পষ্ট। (মান্নান, ১৯৯৪ : ৩)

তবে এই বিচার বলতে সাহিত্যমূল্যেরই বিচার বোঝাতে চেয়েছেন মান্নান সৈয়দ, নৈতিক সামজিক বা অন্যান্য মূল্যের নয়। সমালোচনা বিষয়ে তাঁর অন্য বক্তব্য থেকে বিষয়টি বোঝা যায়। সমালোচনায় বিজ্ঞান কতটুকু দরকার এই পর্যালোচনাওতাঁর প্রবন্ধে আছে। সমালোচক হবেন বৈজ্ঞানিকের মতো নিস্পৃহ বা ব্যক্তিগত রুচি ও মানসিক প্রবণতার উর্ধ্বচারী, আদর্শ সমালোচকের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে এমন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। মান্নান সৈয়দ মনে করেন :

> সমালোচনা ব্যাপারটা পুরোপুরি যুক্তিবাদী নয়, প্রায় যৌক্তিক, পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক নয় – বিজ্ঞানসম্মত। ২+২=৪ – সাহিত্যের মতো সমালোচনাও এরকম সমীকরণ ঘটায় না – কোন বর্ণনায় ধরবে তাকে সমালোচক?... শেষ পযন্ত তাঁকেও জীবনের অতলান্ত রহস্যে মুগ্ধ ও বিস্মিত ও নিঃশব্দ হতেই হয়। (মান্নান, ১৯৯৪ : ২)।

সমালোচনার পেছনে কিছু বৈজ্ঞানিকতা থাকলেও সাহিত্যবিচার যে মূলত শিল্পবস্তু, এবং নির্দিষ্ট কোনো মাপকাঠিতে চিরকাল ধরেএকদেশদর্শী সমালোচনা যে চলতে পারে না, মান্নান সৈয়দের বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> সৃষ্টিশীল রচনা ও সমালোচনা একই জিনিসের দুরকম উৎসারণ। ... যদি সৃষ্টিশীল রচনা বিশ্বচরাচরকে প্রতিবিম্বিত করতে গিয়ে সৃষ্টিশীল রচনা হিসেবে পরিগণিত হয়, তাহ'লে সমালোচনা – যা সৃষ্টিশীল রচনার একটা তির্যক প্রতিবিম্ব – তাও কেন সৃষ্টিশীল হবে না? শেষ-পর্যন্ত সৃষ্টিশীল রচনা ও সমালোচনা দুই-ই সৃষ্টিশীল রচনা। সৃষ্টিশীল রচনার মধ্যে রচয়িতার ব্যক্তিত্বের অভিক্ষেপ ঘটে। সমালোচনার মধ্যেও সমালোচকের ব্যক্তিত্ব বিচ্ছুরিত হয়। তার ফলেই তা চরাচর ও সমালোচ্য রচনা থেকে একটু পৃথক হ'য়ে যায়, আলাদা এক শিল্পরূপ ধারণ করে। (মান্নান, ১৯৯৪ : ৯)

সাহিত্য-বিচারকে কেবল সৃষ্টিশীলই মনে করেননি মান্নান সৈয়দ, মনে করেছেন অনুসৃষ্টি :

> সমালোচনা নির্মাণ নয় – সৃষ্টি। ঠিক সৃষ্টি নয় – অনুসৃষ্টি। ঈশ্বর বা প্রকৃতির সৃষ্টির সমান্তরালে কবি বা লেখক সৃষ্টি করেন; আর কবি বা লেখকের সৃষ্টি অবলম্বন করে সমালোচক করেন অনুসৃষ্টি। (মান্নান, ১৯৯৪ : ৫)

> সমালোচনা হচ্ছে তৃতীয় নির্মাণ। প্রথম নির্মাণ জীবন, যে-জীবনের কোনো বিকল্প সম্ভব নয়। দ্বিতীয় নিমার্ণ সৃষ্টিকর্ম, যা সরাসরি জীবন থেকে পরিগ্রহণ করে। সমালোচনা তৃতীয় নির্মাণ, কেননা সৃষ্টিকর্ম ও জীবন দুয়ের সঙ্গেই তার বিনিময় চলে। বিনিময়ই তাকে সমাজমনস্ক করে, নির্জন,একাকী, বিবিক্ত থাকতে দ্যায় না। সেজন্য এমন সমালোচনা সম্ভব, যা শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের তুল্য বা প্রতিদ্বন্দ্বী। (মান্নান, ১৯৯৪ : ৭)

আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁদের মধ্যে একজন, যিনি স্বদেশ-স্বসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য-বিচার করেছেন। এ সূত্রেই একজন প্রকৃত সমালোচকের সংজ্ঞার্থও নির্ণয় করতে চেয়েছেন তিনি; উৎকৃষ্ট সমালোচকের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করেছেন নানা যুক্তির অবতারণা করে। তাঁর মতে, সাহিত্য-বিচারকের প্রধান গুণ ভালো লেখা শনাক্ত করার মত সংবেদনশীলতা। অর্থাৎ সমালোচক হবেন রুচিশীল, নির্বাচন-ক্ষমতাসম্পন্ন। "সমালোচকের এক প্রধান কুশলতা নির্বাচন। ...শনাক্তিকরণ সমালোচকের এক প্রধান শক্তি ...এও অনেকটা স্বজ্ঞার মতো ব্যাপার।" (মান্নান, ১৯৯৪ : ২)। অর্থাৎ অজস্র লেখার মধ্য থেকেও অভিনব ও কালোত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য বা চিরত্বের আস্বাদযুক্ত সৃষ্টিকে সমালোচক বেছে নিতে সক্ষম হবেন বলে তিনি মনে করেন। যদিও ভালো লেখা দেখেই সাধারণত সমালোচক যে চিনতে পারেন – এর পেছনে তিনি কোনো দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যায়নের কোনো বিশেষ ভঙ্গিকে নয়, বরং দায়ী করেছেন সমালোচকেরই ভেতরে থাকা এক অনির্দেশী বিস্ময়কে। সমালোচকের আরও গুণ হলো – "অনুভূতিকে তিনি যুক্তি ও চিন্তার ভাষায় সাবলীল অনুবাদ করতে সক্ষম; তার নিজের মধ্যেই রয়েছে গভীর বোধ ও সংবেদন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা।" (মান্নান, ১৯৯৪ : ৪) তাছাড়া "তিনিও কবি বা লেখকের মতো স্বাধীন। ...একজন কবি বা লেখককে ঘিরে আত্মান্বেষা জাগ্রত করেন সমালোচক। একজন সৃষ্টিশীল কবি বা সৃষ্টিশীল লেখকের মতোই সমালোচকও বস্তুত সৃষ্টিশীল। তাঁর রচনা অখণ্ড, অপরিবর্তনীয়, অমোঘ। (মান্নান, ১৯৯৪ : ৫) সমালোচককে সৃষ্টিশীল বলার অর্থ হলো স্রষ্টার রচনা এবং সমালোচকের দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলা। সমালোচকের এই এই গুণটিকে মান্নান সৈয়দ বোধ হয় গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন। তিনি এও মনে করেন, "বিষয়ের আত্মার সাথে নিজের আত্মাকে মিশিয়ে দেন সমালোচক। সমালোচকের এই অন্তেঃপ্রবেশ কিন্তু শিল্পী হিসেবে নয়, সমালোচক হিসেবে।" (মান্নান, ১৯৯৪ : ২)

সমালোচনা হবে সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ, তাই সমালোচককে হতে হয় সংবেদনশীল। "তথ্য ও তত্ত্ব, যুক্তি ও প্রতিযুক্তি, চিন্তা ও সংবেদন : এসব পুঞ্জীভূত করতে পারেন সমালোচক। ... আসলে তাকে হতে হয় একাধারে মাননিক ও হার্দিক। মনন ও হৃদয় – নিছক মনন নয় – কিন্তু কখনো মননবর্জিত নয়।" (মান্নান, ১৯৯৪ : ৩) এদিক থেকে স্বচ্ছতাও সমালোচকের বড় গুণ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি; বলেছেন তাঁর আদর্শের বা প্রত্যয়ের কথাও। "সমালোচকও তো আদর্শবান, যে আদর্শ তাঁর পাঠ প্রস্তুতি, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার একটি কেলাসিত রূপ। প্রত্যেক সমালোচক তো অনন্য হ'য়ে ওঠেন তাঁর এই আদর্শ থেকেই। ...সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক যিনি, তিনি সমালোচক নন।" (মান্নান, ১৯৯৪ : ৪) "সাহিত্যের একজন পুরোপরি সঠিক মাত্রার উপযোগী সমালোচকের জন্ম কখনও হয়নি, আর তা সম্ভবও নয়"– সমালোচকের ভূমিকা বা যোগ্যতার মত-বিভিন্নতা প্রসঙ্গে মন্তব্যটি করেছিলেন E. E. Kellet। (Raghukul, 1986 : 10) মান্নান সৈয়দ সমালোচক বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উৎকৃষ্ট সংজ্ঞার্থগুলোর একটা সমন্বয় করে তা সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব অভিমত আছে, আবার রয়েছে কোনো কোনো মতাদর্শের প্রতি ঐকান্তিক আন্তরিকতাও।

সমালোচনার দায়বদ্ধতা বিশেষ সামাজিক দায় – এ প্রসঙ্গে লিখেছেন মান্নান সৈয়দ। সাহিত্যে মূল্যবোধের বিচার বা সমালোচকের সামাজিক দায়িত্ব ও নীতি-নির্দেশনামূলক ভূমিকার উপযোগিতা নিয়ে নানা বির্তক আছে। এ বিতর্কের মুখ্য বিষয় হলো – সমালোচককে নিরপেক্ষ বিচার করতে হবে নাকি প্রয়োজন মতো সামাজিক চেতনাকেও সজাগ রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে মান্নান সৈয়দ স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে, সমালোচকের সামজিক দায়বদ্ধতা শিক্ষক, নীতিবাদী বা উপদেশবাদীর মতো নয়; নির্দেশনাপূর্ণ নয় – এই দায় নীরব, অস্তিত্বহীন কিন্তু সর্বব্যাপী। তিনি লিখেছেন :

> সমালোচনা মানে বিশ্লেষণ। সে বিশ্লেষণে রচয়িতার অন্তঃপ্রকৃতি কেবল বিশ্লেষিত হয় না, হয় তাঁর সমকালীন দেশ-কালও, তাঁর ধারাবাহিকতাও। সেজন্য সমালোচনায় একটি সামাজিক দায়িত্ব উদ্‌যাপিত হয়। সাহিত্যের সত্য কোনোদিন কোনো চলিষ্ণু সামাজিক সত্যের বিরোধী হতে পারে না – অন্তর্গত অর্থে।... সমালোচনা জীবনশ্লিষ্ট এক ব্যাপার। সুতরাং সমালোচনা ব্যাপারটাই সামাজিক ব্যাপার। সমালোচনা সামাজিক। আজকের দিনের কবিতা বা গল্প অনেকখানি ব্যক্তিক। কিন্তু কবিতা বা গল্পের সমালোচনা সামাজিক। (মান্নান, ১৯৯৪ : ৭)

এই সামাজিকতা অবশ্য মান্নান সৈয়দের কাছে মূল্যবধারণ বা মূল্যবিনির্ণয় সংক্রান্ত নয়। এটা সমালোচনার মধ্য দিয়ে নতুন এক ধরনের সৃষ্টির অনুপ্রেরণা বা উপযোগিতা তৈরির পদক্ষেপ।

সাহিত্যে বিষয় বড়ো না রচনার রূপ বড়ো – এ নিয়ে বির্তক দীর্ঘকালের। বিষয়বাদী সাহিত্য-বিচারক সাহিত্যের বিষয়-উপাদান বা content-এর ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। আর রূপবাদীরা জোর দেন প্রকাশের প্রকরণ বা expression-এর ওপর। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রেও সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রীতির মাহাত্ম্য সমভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[১] কারণ বস্তুগত উপাদান ও শিল্পরূপের সমবায়েই সাহিত্য-রস ও সৌন্দর্যের উৎপত্তি হয়, তাই সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও শিল্পরূপ হলো রসনিষ্পত্তির সমবায়ী কারণ একথা ধরে নেয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর বক্তব্যে কিছুটা স্ববিরোধিতার জন্ম দিয়েছেন। তবে শেষপর্যন্ত তিনি ভারতীয় আলংকারিকদের মতাদর্শেই বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেছেন :

> নিহিতার্থ সন্ধান সমালোচনার প্রধান কাজ। রূপ-কে সমালোচনা অগ্রাহ্য করে না, কিন্তু তার অন্তিম গন্তব্য আত্মা। যে সমালোচনা আত্মাকে আবিষ্কার করতে পারলো না, তা বৃথা। আধুনিক সমালোচকের কাছে আধার ও আধেয় তুল্যমূল্য। বিষয়বাদী সমালোচক আধারকে অগ্রাহ্য করেন অনেক সময় – কেননা তিনি জানেন না আধারেও আত্মার আভা লেগে থাকে। দেহাত্মবাদী সমালোচক আধেয়কে অবজ্ঞা করেন অনেক সময় – কেননা তিনি জানেন না রূপদক্ষতার হাজার সিঁড়ি পেরিয়ে কেন্দ্রীয় মন্দিরে পৌঁছানো না-গেলে সবই বৃথা। একজন বিদেশী কবি-সমালোচক লিখেছেন, 'কবিতার ইতিহাস তার টেকনিকের ইতিহাস।' কিন্তু কবিতার ইতিহাস তার আত্মারও ইতিহাস। আত্মা কী চিরকাল এক থাকে? একটু-একটু কী পাল্টে যায় না? কবিতার ইতিহাস তার আত্মার ইতিহাস। (মান্নান, ১৯৯৪ : ১-২)

অর্থাৎ খণ্ডাংশ নয় সাহিত্যর বিষয়বস্তু-রূপ দুই-ই অনুসন্ধান করবেন সমালোচক। সাহিত্য বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে বাক্‌প্রতিমার বিচার যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ তার বিশ্লেষণী ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। শিল্প ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> কবিতা একটি শিল্প। ছন্দ একটা বিজ্ঞান। কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার প্রকাশ।... বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত স্বতঃস্ফূর্তির তলায় তলায় যেমন নিয়মের ধারা বইছে, তেমনি কবিতা ও শিল্পকলার ভিতরে-ভিতরে চলেছে নিয়মের নিহিত নদী। ঐ নিয়মের ধারাই কবিতার বিজ্ঞান তথা ছন্দ এবং রূপপ্রকল্প।... কবিতা হ'য়ে ওঠায় ছন্দ কোনো বাধা নয়, বরং সেই উপায়।... ছন্দ কবিতার শরীরী রূপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছন্দ কবিতার শরীরকে অতিক্রম ক'রে যায়। শেষ পর্যন্ত ছন্দ কবিতার আত্মা। শরীর ও আত্মা যেমন ওতপ্রোত, কবিতা ও ছন্দ তেমনি একাত্মা। ওদের একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা ক'রে ফেলা যায় না। (মান্নান, ২০১৫ : ২৩৩)।

মান্নান সৈয়দের সমালোচনা-ভাবনা পর্যালোচনা করে বোঝা যায় যে সমালোচনা বিষয়ক প্রাচীন-নব্য তত্ত্বসমূহে গভীর অধ্যয়ন ছিল তাঁর। সমালোচনার শ্রেণি বা গোত্রভেদ চিহ্নিত হয়েছে সাহিত্য-বিচারের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষেত্র অনুযায়ী। আবদুল মান্নান সৈয়দ বিচার বিষয়ক মতাদর্শের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করেছেন, তা পর্যালোচনা করেছেন, কোনো কোনোটিতে তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তাঁর

বক্তব্যকে ঘিরে কোথাও কোথাও একটা অস্পষ্টতাও সৃষ্টি হয়, কেননা সাহিত্যকৃতি বিশ্লেষণ এবং এর গোত্রভেদের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন সুস্পষ্ট পথনির্দেশ না করেই। তবে সাহিত্যের নান্দনিক মূল্য আবিষ্কার করাকে তিনি কোনো বিশেষ মতবাদ, গোষ্ঠীবদ্ধতা, বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা পরিবেশের ঊর্ধ্বে ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। বলা যায়, সাহিত্যের আস্বাদনপন্থী সমালোচনাই (যাকে বলে appreciation) চূড়ান্তভাবে কামনা করেন তিনি।

চার

আবদুল মান্নান সৈয়দ ঊনিশ-বিশ শতকের সমালোচনা-তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ বিষয়ে পঠন পাঠনও ছিল তাঁর। সাহিত্য-বিচারে সাহিত্যের আনন্দমূল্য অন্বেষণের গ্রহণযোগ্যতাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়; বিচার বিশ্লেষণও সেখানে রয়েছে, রয়েছে মান-নির্ধারণ। কিন্তু মান্নান সৈয়দের শিল্প-বিশ্বাস বা সমালোচনা-দৃষ্টির কেন্দ্রসুর হলো সৃজনশীলতা, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ইত্যাদির সমন্বয়ে সমালোচনাকে এক নব-নির্মাণে পরিণত করা। তাঁর নিজের করা সাহিত্য-সমালোচনা নিয়ে তিনি কয়েক জায়গায় ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। সমালোচক হিসেবে নিজের যাত্রাশুরুর তথ্যও দিয়েছেন তিনি। *বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা* গ্রন্থের 'প্রবেশক' অংশে তিনি লিখেছেন :

> ঠিক ১৯৬৫ সালে আমি সমালোচক হিসেবে অবতীর্ণ হই। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ছিলো আমার প্রথম সমালোচ্য বিষয়। আমি আমার কলেজ-জীবন থেকে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে আসছিলাম সান্দ্র মুগ্ধতায়– (মান্নান, ১৯৯৪ : ঊনিশ)

কবিতার ভেতরে থাকা 'গোপন অমোঘ জাদু' বা কবিতা পাঠের মুগ্ধতা এবং পাঠকের মনে 'কবিতার শাশ্বতী ভূমিকার' (মান্নান, ১৯৯৪ : বার) জন্যই কবিতায় সবসময় আপ্লুত হয়েছেন মান্নান সৈয়দ, তাঁর কবিতা সমালোচনার কারণও তাই। নিজের সমালোচক সত্তা গড়ে ওঠার অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করেছেন মান্নান সৈয়দ :

> জীবনের সঙ্গে সাহিত্যকে মিলিয়ে নিয়েছি ক্রমাগত। বাংলা ও বিদেশী সাহিত্যের বহু লেখকের কাছ থেকে নানারকম অর্জনে জীবন ভরেছে আমার। শেষ পর্যন্ত বুঝেছি, সমালোচনা-কর্মও নিছক অধ্যয়ন, তথ্য ও তত্ত্বের সমাহার নয়। সমালোচনাকর্মেও লক্ষ্যভেদ করতে হ'লে হৃদয়ের পথ খুঁড়ে খুঁড়ে অগ্রসর হ'তে হয়। (মান্নান, ১৯৯৪ : বিশ)

> সাহিত্য-সমালোচনাকে আমি সৃষ্টিশীল কাজ বলেই মনে করি। সৃষ্টিশীল আনন্দেই প্রবন্ধ লিখি – সমালোচনা লিখি – এমনকি গবেষণাও করি। আমার কবিতা যেমন আবেগের আকস্মিকতার উৎসারণ, প্রবন্ধ-সমালোচনার উৎসও তেমনি মৌহূর্তিক ভাবাবেগের সন্দীপন। এই অভিন্ন আবেগের সংক্রামও আমার কবিতায়-গল্পে-প্রবন্ধে আতত হয়ে আছে – আবার তা থেকে রূপকল্পের বিশেষতায় একটি প্রমুক্তিও। (মান্নান, ২০০৯ : ৯)

অল্পকথায় হলেও আপন সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন মান্নান সৈয়দ। সমালোচনার পদ্ধতি বিষয়ে তাঁর পঠন ও সচেতনতার প্রকাশ ঘটেছে এতে :

> বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ এক কবি-সমালোচক টি.এস. এলিয়ট সাহিত্য সমালোচনার দুটি পদ্ধতির কথা বলেছিলেন – বিশ্লেষণাত্মক এবং তুলনামূলক সমালোচনা। বাংলায় তুলনাত্মক সাহিত্য সমালোচনার ধারা শুরু হয়েছিল শ-দেড়েক বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। সেই ধারা সাহিত্য-সমালোচনার বিচিত্রশাখা পথের মধ্যে বহমান রয়েছে আজো। আমি প্রথমাবধি বিশ্লেষণী সাহিত্য-সমালোচনার রাস্তা ধরে এগিয়েছি। প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলাম ষাটের দশকে – কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে। ...'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কালো সূর্যের নিচে বহ্ন্যুৎসব' নামে আমার দীর্ঘ প্রবন্ধ ধারাবাহিক বেরিয়েছিল 'পরিক্রম' পত্রিকায়। 'পরিক্রম'-সম্পাদক কবি আবদুল গনি হাজারী সম্পাদকীয়-তে আমাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। (মান্নান, ২০০৯ : ৯)

বাংলা কবিতা-কথাসাহিত্য-ছোটগল্প অর্থাৎ সাহিত্যের নানা দিক বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। সমকালীন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের প্রচল পথের বাইরে ছিল তাঁর সমালোচনারীতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য সমালোচনা-গ্রন্থ জীবনানন্দ দাশ বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ *শুদ্ধতম কবি* (১৯৭২)। "*শুদ্ধতম কবি* নিছক গবেষণা-গ্রন্থ মাত্র ছিল না। অধ্যাপকীয় সমালোচনা-সাহিত্যের একটি দৃষ্টান্ত ছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যে রূপতাত্ত্বিক সমালোচনার এই স্তরের দৃষ্টান্ত এর আগে ছিল না। ... পশ্চিমবঙ্গ থেকেও তখন পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে এতটা গভীর ও ভিন্নধর্মী সমালোচনা প্রকাশিত হয় নি। (মাযহার, ২০১২ : ৫৪)। কেবল জীবনানন্দ নন, রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নজরুল গবেষণায়ও তিনি প্রাতিস্বিক হয়ে উঠেছেন। "বাংলাদেশে যাঁরা নজরুল নিয়ে সৃষ্টিশীল, তথ্যপূর্ণ, নতুন, ইতিহাস-সংলগ্ন, শুদ্ধ, যথাযথ ও মৌলিক মূল্যায়ন করতে পারতেন আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁদের অন্যতম। তাঁর জীবনানন্দ দাশ-বিষয়ক কাজও অভূতপূর্ব।" (অনু, ২০১৫ : একুশ)। এছাড়া "রবীন্দ্রচর্চায় নান্দনিক বিবেচনা ও বাঙালি মুসলমান সমাজের জীবনদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রব্যাখ্যায় আবদুল মান্নান সৈয়দের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।" (মাযহার, ২০১২:৫৬)। *রবীন্দ্রনাথ* (২০০১) নামক গ্রন্থটি ছাড়াও তাঁর রবীন্দ্র-বিষয়ক অনেক রচনা রয়েছে। সংকলিত প্রথম প্রবন্ধ 'দোলাচল অবিশ্রাম চলছিল'-তে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন :

> ...রবীন্দ্রনাথ যেমন বহুমুখী বহুআয়তনিক তেমনি সদাউদ্ভিন্নমান ও চিরচলিষ্ণু। ... রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিটি শিল্পকর্মেই নিজের ধরনে একটি সম্পূর্ণতা দিয়েছেন। (উদ্ধৃত, মাযহার, ২০১২ : ৫৬)

বাংলা সাহিত্যের আলোচিত, কম আলোচিত বা সমসাময়িক গৌণ সাহিত্যিকেরা প্রায় সমান মনোযোগে বিশ্লেষিত হয়েছেন মান্নান সৈয়দের লেখায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মশাররফ হোসেন, মোহিতলাল মজুমদার, জসীমউদ্‌দীন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত,

বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, কাজী ইমদাদুল হক, সিকান্দার আবু জাফর, আহসান হাবীব, হাসান হাফিজুর রহমান, কাজী মোতাহার হোসেন – মান্নান সৈয়দের সাহিত্যে-বিবেচনার এই তালিকা আসলে আরো দীর্ঘ। উল্লিখিত লেখকগণ ছাড়াও অগ্রজ-সমকালজ-অনুজ অনেক লেখক সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা সমান গতিশীল থেকেছে। *বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা* গ্রন্থের 'প্রবেশক' অংশে এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> আমি শুধু বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠিত লেখক-কবিদের রচনা বিশ্লেষণ-মন্তব্য-আলোচনা ক'রেই ক্ষান্ত হইনি, আমার কালের জীবিত লেখকদের বই-এর আলোচনাও ক'রে চলেছি গত তিন দশক ধরে। যে-দূরত্ব সৎ-সমালোচনার জন্য প্রয়োজন, বই রিভিয়্যু করতে গিয়ে তা পাওয়া যায় না বটে – কিন্তু সমকালীন লেখকদের প্রতি একজন সমালোচকের দায়িত্ববোধ থেকে এসব সমালোচনা করেছি। সমকালিক একজন পাঠকের চিত্তে এই কালের কোনো বই কী প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছিলো, তার নমুনা হিশেবেই এগুলোকে ভঙ্গুর পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে তুলে এনে একটি গ্রন্থের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আশ্রয় দেওয়া হ'লো।

করতলে মহাদেশ গ্রন্থভুক্ত 'আমাদের কবিতার চারদিক' প্রবন্ধে মান্নান সৈয়দ বাংলাদেশকেন্দ্রিক কবিতার, বিশেষত ষাটের দশকের ও স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের কবিতার রূপরেখা বিচার করেছেন। সমকালের কবিতা-সংকলক, পত্রিকা সম্পাদক ও কবিতা বিষয়ে বিশ্লেষণী মতামতসহ বাংলাদেশের কবিতাধারার ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন তিনি। ষাটের দশকে প্রকাশিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিন, যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল– রফিক আজাদ সম্পাদিত 'স্বাক্ষর' (প্র. প্র. ১৯৬৩), জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত 'কালবেলা' (প্র. প্র. ১৯৬৫), ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত 'পূর্বলেখ' (প্র. প্র. ১৯৬৬), আবদুল্লাহ আবু সয়ীদ সম্পাদিত 'কণ্ঠস্বর' (প্র. প্র. ১৯৬৫) এবং আরো অনেক। এই ম্যাগাজিনগুলোকে কেন্দ্র করে "সমকালীন প্রতিশ্রুতিশীল কবিবৃন্দ একত্রিত হয়েছিলেন।" (মান্নান, ২০১৫ : ১৪৭)। এছাড়াও সমকালের কবিতা-সংকলনসমূহও কবিতা-চর্চার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। কেননা, সৈয়দের মতে, "সংকলন মানেই সমালোচনা...একটি সংকলন থেকে সংকলয়িতার সাহিত্যরুচি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আস্বাদ পাওয়া যায়। এদিক থেকেই কোনো-কোনো সংকলনকে সমালোচনার সমান মূল্য দেওয়া হচ্ছে।" (মান্নান, ২০১৫ : ১৪৭-১৪৮)। এ প্রসঙ্গেই তিনি আরো বলেন :

> (ষাট ও সত্তর দশকের) এই কবিতা সংকলনসমূহে বাংলাদেশের কবিতা পরস্পর স্থিরীকৃত। যদি কেউ বাংলাদেশের কবিতার ধারাবাহিক গতি আর তার পরিপ্রেক্ষিত সন্ধান করেন, তাহলে এই সংকলনগুলো থেকে তার ঘনিষ্ঠ আন্তরিক পরিচয় পাবেন। এখানে আছে প্রত্যক্ষ কবিতা আর উজ্জ্বল মেধাবী উপস্থাপনা। এই

> কবিতাগুচ্ছ প্রমাণ করবে বাংলাদেশের কবিতা আবহমান বাংলা কবিতার উত্তরসাধক আধুনিক বাংলা কবিতার সমবয়সী, যুক্ত ও স্বতন্ত্র।(মান্নান, ২০১৫ : ১৫২)।

সমকালীন কবিদের কবিতাধারার একটা ইতিহাস-চিত্র রূপায়ণের পাশাপাশি একজন প্রকৃত কবিতা-সমালোচকের মতোই কবিতার অর্ন্তলোক, কবিতার রূপশৈলী এবং পরিপ্রেক্ষিতের সাথে যুক্ত করে কবিস্বভাবকে নির্ণয় করেছেন তিনি। কবিতার মতো আত্মবৃত কর্ম কীভাবে শেষপর্যন্ত বহির্ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত, সেই মূল্যায়ন তিনি করেছেন একজন সৃষ্টিশীল কবি হিসেবেই। আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা-বিচার সম্পর্কে সমালোচক লিখেছেন :

> কবিতার রস আস্বাদনে তিনি মুক্তপ্রাণ গদ্য লেখক। আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রাবন্ধিক সত্তার এই হচ্ছে এক বড় দিক। কবিতার সৌন্দর্য সন্ধানে তিনি অবলোকন করতে সক্ষম বাংলা কবিতার অখণ্ড ভূগোলকে। ... বাংলা ভাষার প্রধান কবিদের প্রায় সকলেই তাঁর কলমে বিশ্লেষিত ও বিবেচিত হয়েছেন। এর সূচনাপ্রান্তে যেমন রয়েছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তেমনি রয়েছেন সাম্প্রতিকতম কবিগণও। (মাযহার, ২০১২ : ৫৫)

তাছাড়া শিল্পদৃষ্টিতে আধুনিকতাবাদী পক্ষের হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যিক সিদ্ধি পাওয়া লেখকমাত্রকেই শিল্পবিবেচনার অর্ন্তগত করে নিতে পেরেছেন তিনি। "এখানে তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তা বড় হয়ে ওঠে সংকীর্ণ আধুনিকবাদী ধারণার শিল্পবিচারের প্রচল পথ থেকে।" (মাযহার, ২০১২ : ৫৭)। সমালোচনার ভাষারূপ সম্পর্কেও মান্নান সৈয়দ উচ্চধারণা পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে তার যৌক্তিক বক্তব্য ছিল। তিনি মনে করতেন, 'কী বলছি তার মতোই তাৎপর্যপূর্ণ কীভাবে বলছি।' তাঁর মতে, সমালোচনার ভাষা হবে স্বচ্ছ। 'আমার গদ্য' (*আমার বিশ্বাস* গ্রন্থভুক্ত) নামক লেখায় তিনি বলেছেন :

> গদ্যকাজে প্রকরণ বলতে আমি বুঝি শব্দ ব্যবহারের ধরন, বাক্য নির্মাণের কৌশল, অনুচ্ছেদ তৈরির পদ্ধতি, এককথায় সম্পূর্ণ রচনাটির গঠনকলা।
>
> আমাদের দেশে যেহেতু আলোচনা-সমালোচনামাত্রই একান্তভাবে বিষয়নির্ভর; কাজেই আমাকে দীর্ঘকাল অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। (উদ্ধৃত, মাযহার, ২০১২ : ৬৩)

বিষয়ের সঙ্গে ভাষার অনিন্দ্য উপযোগিতা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তিনি। কবির সমালোচনায় তাঁর ভাষা কবিতার মতোই গীতল ও তাতে এক ছন্দস্রোত অন্তঃশীল থাকে। *শুদ্ধতম কবিতে* তিনি প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের কবিতায় কবির আত্মপ্রকাশের তুলনামূলক বিচার করেছিলেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা কাব্যে কবি নিজের পরিচয় পূর্বাহ্নে দাখিল করে নিতেন। কিন্তু কাব্যবিষয়ের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল

প্রত্যক্ষত অতিব্যবহিত। কালান্তরে ব্যক্তিক দৃষ্টি তথা প্রাতিস্বিকতা দখল করে নিল শিল্প পরিসর। মান্নান সৈয়দ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> আধুনিককালে এসে ঐ সমবায়ী সমর্পণের দরকার হ'লো না আর, আত্মগোপনই হয়ে দাঁড়াল অপ্রাসঙ্গিক : বিহারীলাল বা মধুসূদন নিজেদের উপস্থিত করেছেন তাঁদের কবিতাবলয়ে। সারাজীবন অজস্র সমাজ-প্রসঙ্গে লগ্ন ও পরিকীর্ণ থেকেও অন্তঃজীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহসা আপন আত্মাকে 'মহা-একা' বলে শনাক্ত করে গেছেন। আর নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী – যা দিয়ে তাঁর সাহিত্যভুবনে প্রবেশ, সে সমাজ-বিদ্রোহের নয় কবির অতিবেল অস্মিতারই এক প্রদীপিত বাণীরূপ। এমনকি অদ্রোহী জীবনানন্দ দাশও প্রবেশমুহূর্তে মৃদু মর্মরে বলে উঠেছিলেন : 'কেউ যাহা জানে নাই – কোনো এক বাণী/আমি বহে আনি' এবং তারপরই 'আমার মতন আর নাই কেউ।'
>
> ...প্রাতিস্বিকতা বিজনতারই দ্বিতীয় অভিধা। সামাজিক প্রবাহের ভিতরে ব্যক্তি এক-একটি দ্বীপের মতো – সামাজিক তরঙ্গাবলি তার দ্বীপশরীরে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে। কল্পনা যেন সেই দ্বীপেরই শান্তিসবুজ, সেই দ্বীপেরই শান্তিশষ্প – যদিচ সমস্ত দ্বীপের সমস্ত ঘাস একরকম নয়। যে-আমরা প্রাত্যহিকতার সুর-মোটা নানা সূত্রে যোজিত, তার বাইরে তথা খুব ভিতরে একা আমরা; মুখোমুখি একা। শিল্পমনীষা এই দর্পণে বিম্বিত আননটিকে ক্রমাগত শব্দে বর্ণে অনূদিত করে ফেলতে চায়। (মান্নান, ২০১১ : ১২০-১২১)

সমালোচনার গদ্যকে সৃষ্টিশীল করে মান্নান সৈয়দ এভাবেই পাঠকের পক্ষে সাহিত্য-রস আস্বাদনের উপযোগী জ্ঞানগত পরিবেশ রচনা করে দিতে চেয়েছেন। তবে তাঁর সমালোচনার ধরন সবসময়ই 'ইম্প্রেশনিস্টিক' অথবা পুরোপুরি কবিত্বপূর্ণ নয়। সাহিত্যরূপের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বা রূপবাদী সমালোচনা-ভঙ্গিতেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ; যেখানে রয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার ও মূল্যনির্ধারণ। এদিক থেকে তাঁর ভাষা কিংবা সমালোচনা ভঙ্গি অনেকটা বুদ্ধদেবীয় সমালোচনার সমগোত্রীয়।

সমালোচনার তাত্ত্বিক রূপের পরিবদল, পরিমার্জনা বিভিন্ন সময়ে হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। মান্নান সৈয়দের সমালোচনা-ভাবনা ও তাঁর সমালোচক-সত্তার যুগোপযোগিতা তথা মান নির্ধারণ প্রসঙ্গে একথা সর্বাগ্রে স্মর্তব্য যে, তাঁর সময়সীমায় বহু সাহিত্যিকের বিচিত্রবিহারী সমালোচনার মধ্য দিয়ে তিনি একজন শক্তিশালী সংগঠকের ভূমিকাও নিয়েছিলেন। শিল্প-সাহিত্য-সমালোচনার সংজ্ঞার্থ, নানা তত্ত্বরূপ, সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে; সমালোচনায় উদার ও গ্রহিষ্ণু স্বভাবের উদাহরণ সৃষ্টি করে সর্বোপরি শিল্পের প্রতি একনিষ্ঠ নান্দনিক অনুভব নিরন্তর প্রকাশের মধ্য দিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ অনন্য ও প্রাতিস্বিক হয়ে আছেন। বাংলা বা বাংলাদেশকেন্দ্রিক সমালোচনায় তার সমালোচনাকর্মের গৌরব তাই অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই।

টীকা

১ অলংকারশাস্ত্রে ভারতীয় আলংকারিকগণ সৌন্দর্যের স্বরূপ, মাপকাঠি ইত্যাদির কথা বলেছেন। এছাড়াও আছে শব্দ, বাক্য, ব্যঞ্জনা, ঔচিত্য, রস, কাব্যের দোষ-গুণ, শ্রেণিবিভাজন ইত্যাদি। রসবাদী, ধ্বনিবাদী বা অলংকারবাদী আলংকারিকেরা কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে আনন্দ দানের কথাই বলেছেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁরা রস, ব্যঞ্জনা, রীতি, ঔচিত্য বা অলংকারকে বিষয় ধরেছেন। অভিনব গুপ্ত কাব্যরসের আস্বাদকে বোঝাতে চেয়েছেন ঘন আনন্দরূপ চেতনা হিসেবে। ভারতীয় মতে, বাচ্যার্থের আশ্রয় ছাড়া কখনও আনন্দ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ভাব-বস্তু-অলংকার-রীতির সমবায়ে বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কাব্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে বাচ্যাতীত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি বা বিষয়ের অনুরণন। বাচ্যাতিরিক্ত এই অনুরণন বা ব্যঞ্জনাই হল কাব্যের আত্মা। (দ্রষ্টব্য, অতুলচন্দ্র, ১৯৬৩ : ২-২০)

গ্রন্থপঞ্জি

অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৯৬৩)। *কাব্যজিজ্ঞাসা*, বিশ্বভারতী, কলিকাতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০২)। *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অনু হোসেন (সম্পা. ২০১৫)। *আবদুল মান্নান সৈয়দ রচনাবলি* (তৃতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৯৪)। *বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০০৯)। *দুই কবি*, সূচীপত্র, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১১)। *শুদ্ধতম কবি*, তৃতীয় সংস্করণ, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

আহমাদ মাযহার (২০১২)। *আবদুল মান্নান সৈয়দ : সর্বসত্তা নিমগ্ন সাহিত্যিক*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৬)। *সাহিত্য বিচার: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

ভীষ্মদেব চৌধুরী (২০০৩)। 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্যগবেষণা', *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য* [সম্পা. সাঈদ-উর রহমান], বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৪)। *রবীন্দ্র রচনাবলী* (দ্বাদশ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, ঐতিহ্য, ঢাকা

Dr. Raghukul Tilak (1986). *History and Priniciples of Literary Criticism*, Eighth edition, Rama Brothers, New Delhi.